কোশি নদীর বন্যা ঃ আমাদের দায়

অনুপম মিশ্র

(এই লেখাটির রচনাকাল, অবিশ্বাস্য হলেও, ২০০৪ সাল। ২০০৮ সালের ৮ সেপ্টেম্বর থেকে কোশি নদীর প্রলয়ঙ্কর বন্যাকে যতই 'আকস্মিক' 'বিপর্যয়' বলে প্রচার করা হোক, প্রকৃতপক্ষে এটি দীর্ঘকাল ধরে নদীর সঙ্গে ভুল ব্যবহার করার অনিবার্য ফল-একথা লেখাটিতে স্পষ্ট। এবং এই প্রলয়বন্যার সংকেতও নদী দিচ্ছিল বহুদিন ধরে। এ রাজ্যের ২০০০ ও ২০০২ সালে বন্যার কথা আমাদের খুব স্বাভাবিকভাবেই মনে পড়ে। ১৮ সেপ্টেম্বর হীরাকুদ বাঁধ থেকে একবারে সাড়ে চার লক্ষ কিউসেক জল ছাড়ার ফলে ওড়িশার বীভৎস বন্যা, মহারাষ্ট্র গুজরাটে বন্যা-মাটি ও জলের শৃঙ্খলা ভেঙে ফেলার দরুন এই প্রলয়। যার ফলে সর্বস্বহারা হচ্ছেন, প্রাণ হারাচ্ছেন কোটি কোটি মানুষ।)

উত্তর বিহার জুড়ে বিহার করে নদীকূল, সেইখানে তারা খেলে, ছুটোছুটি করে, পুরো এলাকাটাই যেন তাদের নিজেদের। তার ফলে ওখানে তারা জায়গা থেকে একটু সরে গেলে সেটাকে কেউ 'পথ পরিবর্তন' বলে ধরে না। উত্তর বিহারের জীবনের একটি সুন্দর দর্পণ যদি হয় সেখানকার সাহিত্য, অন্য একটি তরল দর্পণ তাহলে এখানকার নদীমালা। এই অসংখ্য নদীতে সমাজ আপন মুখ দেখত আর চঞ্চল কল্লোলিত স্রোতস্বিনীর স্বভাব বড়ো ভালোবাসায় এঁকে নিত নিজের মানসপটে। তাই কখনো কবি বিদ্যাপতির মর্মস্পর্শী কাহিনী গাঁথা হয়েছে, কখনো ফুলপরাসের মত মধুর গাথা নদীতীরের বালিতে আঁকা রয়েছে। জল সেই বালিরেখাকে ধুয়ে দেয়নি বরং নিত্যসিঞ্চনে শিলালিপি করে তুলেছে তাকে। সে শিলালিপির কথা ইতিহাস বইয়ে লেখা থাকুক নাই থাকুক, লোকস্মৃতিতে অবশ্য রয়ে গিয়েছে। ফুলপরাসের উপাখ্যানটি এখানে আবার বলা যায়।

ভুতহী নদী একবার ফুলপরাস নামের জায়গা থেকে নিজের পুরোন পথ ছেড়ে অন্য পথে চলে যায়। ভুতহীকে ফিরে আসবার অনুরোধ উপরোধ জানিয়ে পুজো, যজ্ঞ আরম্ভ হল। সেই মিনতিতে সাড়া দিয়ে আবার ফুলপরাসে ফিরে এল ভুতহী।

এসব উপাখ্যানের গুরুত্ব এই যে, একটি নদী নিজের পথ ছেড়ে সরে আসে মৃত্যুপথযাত্রী কোনো কবির প্রার্থনায়, কিংবা পুরোনো পথ ছেড়ে সরে যাওয়া নদী আবার খাতে ফিরে আসে সাধারণ মানুষদের আগ্রহে, নদীর এই চলনকে তীরবাসী মানুষরা সাধারণভাবেই মেনে নিত। এই খেয়ালিপনা জেনেই তাদের সঙ্গে বসবাস করা

লোকেদের কাছে স্বাভাবিক ছিল। উপাখ্যানমালা আমাদের নির্দেশ করে যে যা কিছু ভুলে গিয়েছ তাকে আবার মনে করো।

কিছু কিছু নদীর বিচিত্র নাম সমাজ হাজার বছরের অভিজ্ঞতা থেকে দিয়েছে। এমনই এক নদীর নাম অমরবেল ('বেল' অর্থ লতা-অনুবাদক)। কোথাও কোথাও একে আকাশবেলও বলে। লোকশ্রুতি এই যে এ নদীর উৎস বা সঙ্গম কেউ চোখে দেখেনি। বর্ষাকালে হঠাৎ কোথা থেকে এ আবির্ভূত হয় আর গাছের ওপর ছেয়ে যাওয়া সোনালি লতার মতোই একটা বিরাট এলাকা জুড়ে নানা ধারায় বইতে শুরু করে। আবার এক সময়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। পরের বছর যে আবার ঠিক সেই পুরোনো খাতগুলি দিয়েই বইবে তারও কোনো মানে নেই। তখন হয়তো নিজের অন্য পথের হাল খুঁজে নেবে। একটি নদীর নাম দস্যু নদী। এ নাকি দস্যুর মতো অন্য অন্য নদীদের জলবৈভব হরণ করে। এ জন্য পুরোনো কিছু সাহিত্যে একে বৈভবহরণ বলেও উল্লেখ করা হয়েছে।

আবার একেবারে চলতি শব্দে নদীর নামও বিরল নয়। একটি নদীর নাম মরণে। কারো নাম মরণগঙ্গা। ভূতহা বা ভূতহীর কথা তো আগে বলাই হল।[১] যে দেশে অজস্র নদী সব নিয়ম ভেঙে কখনও এখান দিয়ে কখনও ওখান দিয়ে বইতে থাকে, সেখানেই আবার এমনও নদী আছে যে নিজের ধারা ছেড়ে এক পা-ও এদিক ওদিক যায় না। তার নাম হয়ে গেছে-ধর্মমূলা।

এই ভূগোলজ্ঞানী সমাজ আজ ভেঙে টুকরো হয়ে যাচ্ছে। এঁরা মানতেন যে নদীরা কখনও জীবন্ত থাকে, প্রকাশ হয়, কখনও বা অদৃশ্যও হয়ে যেতে পারে। নদী মরে যায়, ভূতও হয়ে যায় এমনকি। এরকম সব হবার কারণ এই যে নদীর ধারার সঙ্গে ওপর থেকে বয়ে আসা মাটিতে নদীর খাত ভরে যাওয়া কিংবা ভাঙন দুইই চলতে থাকে দ্রুত এবং নিরন্তর। তাই নদীর রূপও বারে বারে বদলায়।

অনেক ছোট ছোট নদীর বর্ণনাতেও এমন কথা বলা হত যে এর দহে হাতি পড়লেও ডুবে যাবে। সেইসব ছোট নদীতেও বর্ষার পাথরের বিরাট বিরাট খণ্ড বয়ে আসে। আর জলের তোড়ে যখন তারা একটা অন্যটার সঙ্গে ধাক্কা খায় তখনকার বিকট শব্দে আকাশেরও কানে তালা লেগে যায়। আবার কিছু নদীর ব্যাপারে লোকে বলে যে বর্ষাকালে সে সব নদীতে এত কুমির আসে যে জল ভর্তি করে গোবরের মতো কুমিরের নাক তাহলে থুতনি কি লেজের ডগা ভেসে থাকে। এই নদীগুলি বর্ষার সময়ে প্রায়ই একটা অন্যটার সঙ্গে মিশে যেত-জল দেয়ানেয়াও করত। বর্ষার নদীদের এই খেলাধুলোকে আর আমরা 'ভয়ংকর বন্যা' বলে আখ্যা দিয়েছি। বারোহীক্ষেত্রের' মানুষরা এই খেলাকে অন্যভাবে দেখতেন। মানুষ এখানে বন্যার জন্য অপেক্ষা করত।

এইসব নদীতে এসে পড়া বন্যার বিশাল জলকে লোকেরা বড় বড় পুকুর দীঘি কেটে নদীর পথ থেকে সরিয়ে নিতেন। তাতে বন্যার ধ্বংসলীলা কিছু কম হত। পুরোনো ভাষায় একটা কথা ছিল 'চারকোসী ঝাড়ি'। নতুনরা, কমবয়সীরা-এ বিষয়ে বিশেষ কিছু

শোনেননি। এলাকার বয়স্ক মানুষদের কাছ থেকে যতটা সম্ভব খোঁজখবর করলে জায়গাটা সম্পর্কে কিছুটা আন্দাজ করা যায়। 'চারকোসী ঝাড়ি'র খানিক অংশ বোধ হয় চম্পারণে এখনও টিকে আছে। শোনা যায় যে পুরো হিমালয়ের তরাই অঞ্চল জুড়ে চার ক্রোশ চওড়া একটি ঘন জঙ্গল অঞ্চলকে সযত্নে রক্ষা করা হত। পুরো বিহারের এগারো বারো'শ কিলোমিটার দৈর্ঘ্য জুড়ে এই বনাঞ্চল বিস্তৃত ছিল। উত্তরপ্রদেশের পূর্বাঞ্চলের তরাই পর্যন্ত ছড়ানো[৩] এই ঘন বনের কটিবন্ধ ছিল বিশাল হিমালয়ের সমস্ত দৈর্ঘ্য জুড়ে। এখনকার প্রচুর অর্থব্যয়ে নির্মিত, কোনো-কাজে-না-আসা এমব্যাংকমেন্ট বা তটবন্ধগুলির তুলনায় এই দীর্ঘ, প্রশস্ত বন-বাঁধ বর্ষার পাগলা জলের তোড় আটকানোর পক্ষে অনেক বেশি কার্যকরী ছিল-এ কথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। বন্যা নিশ্চয়ই তখনও আসত, কিন্তু তা এমন বিধ্বংসী হত না।

আড়াই হাজার বছর আগেকার এক কথোপকথনে আমরা বন্যার কিছু বর্ণনা পাই। ভগবান বুদ্ধ ও এক গোয়ালার মধ্যে কথা হচ্ছিল। সেই সন্ধ্যায় গৌতম বুদ্ধ সেই গোপালকের গৃহে পৌঁছেছেন। কালো মেঘে আকাশ ঘন হয়ে আছে। গোয়ালা বুদ্ধকে বলছে যে তার ঘরের চাল সারানো হয়ে গেছে, ফসল কেটে তোলা শেষ। গোরুগুলি ঠিক মত খুঁটিতে বাঁধা আছে। এখন আর বন্যার জন্য কোনো ভয় নেই। যত খুশি বৃষ্টি হোতে থাকুক। ভালোই হবে, নদীর দেবী দর্শন দিয়ে যাবেন। বুদ্ধ তার উত্তরে বলছেন, তিনিও তৃষ্ণার তরীগুলি খুলে দিয়েছেন খুঁটি থেকে। বন্যায় তাঁরও চিন্তা নেই কোনো। এক যুগপুরুষ এক গোয়ালার কুটিরে রাত কাটাবেন নদীর ধারে। নদীতে সেই রাত্রে বান আসতে পারে কিন্তু উভয়েই নিশ্চিন্ত। আজকে কি সম্ভাবিত বন্যার আগের দিন এরকম এক নিরুদ্বেগ আলাপচারিতার কথা ভাবা যায়?

এইসব প্রসঙ্গ থেকে অন্তত এটা পরিষ্কার যে লোকে এই জলের সঙ্গে, বন্যার সঙ্গে তাল দিতে জানত। এই জায়গার সমাজ বন্যায় সাঁতার দিতে জানত, তার আয়ত্ত ছিল বন্যা পার করে বাঁচবার কলাকৌশলও। উত্তর বিহারের এই সম্পূর্ণ এলাকায় বড় জলাশয় বোঝাতে হ্রদ আর চৌর বা চৌরা এই শব্দ দুটি ব্যবহৃত হয়। প্রাচীন ও বিশাল জলাশয় বিষয়ক বহু সাহিত্য পাওয়া যায়, যেমন দ্বারভাঙা জেলার একটি বিশাল সরোবর বা হ্রদের বর্ণনায় প্রায় মহাকাব্যিক আলঙ্কারিকতা পাওয়া যাবে। একেবারে অগস্ত্য মুনিকেই সম্বাধন করে বলা হচ্ছে 'তুমি এক সময়ে গণ্ডুষে সাগর পান করেছিলে বটে, কিন্তু এই সরোবর যদি পান করে নিতে পরো তো বুঝি!' বাস্তবে সমুদ্রের বিশালতার সঙ্গে এই হ্রদের পরিসরের তুলনা হয় না, একথা সেই মানুষেরাও নিশ্চয়ই জানতেন। তবু যেন এই এক আনন্দময় খেলা।

ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ওই অঞ্চলের বড় বড় সব জলাশয় নিয়ে অনেক কাহিনীর চল ছিল।

বৃষ্টির অতিরিক্ত জলের অনেকটা চৌরগুলোয় আটকা পড়ত। পরিহারপুর,

ভরওয়ারা, আলাপুরের মতো সব জায়গায় লম্বা চওড়ায় দুই-তিন মাইল হ্রদও দেখা যেত। কিন্তু ধীরে ধীরে কিছু লোকের মধ্যে লোভের টান দেখা দিতে লাগল, যাদের মনে হল যে এত বড় বড় জলাশয়ে কত মাটি আটকা পড়ে নষ্ট হচ্ছে, কিছুটা জল মেরে দিলে খানিকটা বেশি চাষের জমি পাওয়া যাবে। এই চিন্তা করে দু চারটে খেত হয়তো বেড়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দুশো চারশো খেত বন্যার জলে বিসর্জন দিতে হয়। বন্যার জলের একটা বড় অংশ তার আগে পর্যন্ত এই প্রকাণ্ড জলাশয়গুলোতে সঞ্চিত থাকত।

ইংরেজী 'রেন ওয়াটার হারভেস্টিং' শব্দটি এখন খুব জনপ্রিয়। কিন্তু এর বহু বহু আগে থেকে এই ধরনের অনেক বড় কাজ উত্তর বিহারের মানুষরা করে আসছেন। তা হল 'ফ্লাড ওয়াটার হারভেস্টিং', বন্যার জলকে ঠিক মতো লাগানোর কাজ। বড় বন্যা তখনও আসত কিন্তু তখনকার মানুষ বন্যার ক্ষয়ক্ষতিকে সবচেয়ে কম করতে সক্ষম ছিল। তালাব অর্থাৎ জলাশয়ের একটা নাম পাওয়া যায়-নদীয়া তাল। মানে সেইসব জলাশয় বর্ষার জলে নয়, বরং নদীর জলে ভরে থাকত। বর্ষার বৃষ্টিতে ভরে ওঠা দীঘি পুকুর সারা দেশেই দেখা যায়, কিন্তু হিমালয় থেকে সরাসরি নেমে আসা নদী সব এত প্রবল জল নিয়ে নিচে নামত যে নদী ছাপানো জলে ভরে উঠবে এরকম পুকুর কাটাটাই সবচেয়ে বেশি কার্যকরী ছিল। নদীর উপছে ওঠা জল অসংখ্য পুকুরে জমা হতে হতে, পরিমাণে কম হতে হতে যত নিচে নামত, বন্যার মারণক্ষমতার বদলে তা উপকারে পরিবর্তিত হতে থাকত। তারপর এক সময়ে গঙ্গার শান্ত শীতল ধারার কোলে গিয়ে মিশত।

আজকের নতুন প্রজন্ম দম্ভ ভরে মনে করেন যে সমাজের লোক অশিক্ষিত, পিছিয়ে পড়া। উত্তর বিহারের বন্যা ক্রমশ নিচে নেমে পশ্চিমবাংলা হয়ে বাংলাদেশে চলে যায়। একটা মোটামুটি আন্দাজ আছে, যে জলরাশি বর্ষায় বাংলাদেশের ওপর দিয়ে বয়ে যায় তার শতকরা মাত্র দশ ভাগই বৃষ্টির জল। বাকিটা আসে বিহার নেপাল ইত্যাদি বাইরের এলাকা থেকে। বাংলাদেশের প্রধান তিনটি নদী পদ্মা, মেঘনা, যমুনা (ব্রহ্মপুত্রের স্থানীয় নাম)। শতকরা নব্বই ভাগ জল আসে এই নদীপথে, মাত্র দশ ভাগই বৃষ্টির জল। এইসব প্রকাণ্ড নদীর তীরে এবং নদী সঙ্গমে বাস করতে অভ্যস্ত ছিলেন বাংলাদেশের মানুষরা। সেখানে নদী কয়েক কিলোমিটার চওড়া। আমাদের এখানে যেমন নদীর এক পাড়ে দাঁড়িয়ে অন্য পাড় দেখা যায়, সেরকম নয়। বাংলাদেশের এক একটি নদী দিকচক্রবাল পর্যন্ত প্রশস্ত। সেই নদী সকলের কিনারে বাসবাসকারীরা কেবল যে বন্যার সঙ্গে মিলেমিশে বাস করতেন তাই নয়, তাকে নিজেদের পক্ষে উপকারীও করে তুলতে জানতেন। বন্যা হওয়া ছিল অবধারিত, তা থেকেই এ দেশের অধিবাসীরা প্রচুর ধান ফলাতেন। যে ধান এ দেশের 'সোনার বাংলা' নামকে অর্থপূর্ণ করেছিল।

কিন্তু ধীরে ধীরে সেই 'চারকোসী ঝাড়ি' চলে গেছে! চৌর আর হ্রদও গিয়েছে। অল্প জায়গায় ভালোভাবে চাষ করতেন যারা, বড় জায়গা নিয়ে চাষ করবার লোভ তাদের

পেয়ে বসেছে। আর এখন আমরা বন্যায় ডুবছি। গ্রামে লোক বসতি কোথায় হবে, কোথায় হতে পারবে না-তার বহু নিয়ম থাকত। চৌর-এ কেবল ফসল খেত থাকবে, বসতি হবে না-এই নিয়ম ভেঙে গিয়েছে। ফলে বন্যাও তার নিজের নিয়ম ভাঙছে। ধীরে ধীরে, জনসংখ্যার চাপে হোক বা অনিয়ন্ত্রিত উন্নয়নের কারণে, আমরা বন্যার নিজস্ব এলাকার মধ্যে নিজেদের মালপত্র রাখতে শুরু করেছি। বাড়িঘর তৈরি করে ফেলেছি। এতে নদীদের দোষ কোথায়? আমার বাড়ির একতলা পর্যন্ত যদি জলে ডুবে গিয়ে থাকে তার মূল কারণ এই যে আমার বাড়িটা বন্যার রাস্তা জুড়ে তৈরি করা।

গত দু-একশো বছরে আরো একটা খুব বড় ব্যাপার ঘটেছে, তা হল বাঁধ আর এমব্যাংকমেন্ট (পাড়বাঁধ)। নদীদের স্বভাব কিছুমাত্র না বুঝে তাদের ওপর যেখানে সেখানে ছোট থেকে বড় বাঁধ তৈরি করা হয়েছে। নদীর এধার থেকে ওধার বিপথে যেন না যায় সেই কারণে এক নতুন বিপথগামিতার পরিকল্পনা করা হয়েছে, তার নাম এমব্যাংকমেন্ট বা পাড়বাঁধ। এ জিনিস এমনকি বাংলাদেশেও হয়েছে। শত শত মাইল এই পাড়বাঁধের দৈর্ঘ্য। আর আজ আমরা বুঝতে পারছি যে পাড়বাঁধ দিয়ে বন্যা আটকানোর বদলে বরং বন্যা বেড়েছে এবং শেষ পর্যন্ত ক্ষতি অনেকগুণ বেড়েছে। এখন কোনো কোনো অঞ্চলে এর একমাত্র উপকারিতা এইই দাঁড়িয়েছে যে যখন পাড়বাঁধের কারণে কোথাও ভয়াবহ বন্যা হয় ও সব দিক জলে ডুবে যায়, তখন লোকে এই বাঁধগুলির ওপরে উঠেই পরিত্রাণ পেতে পারে। যে ব্যবস্থা করা হয়েছিল বন্যা বন্ধ করবার জন্য আজ সেটা শুধু বন্যার সময়ে আশ্রয় নেবার জায়গায় পর্যবসিত হয়েছে। এসব বিষয়ে মনোযোগ দিয়ে ভাবনা করা দরকার। বহুদিন ধরে লোকে বলছে যে পাড়বাঁধ বা তটবন্ধ কোনো কাজের জিনিস নয়। কিন্তু উত্তর বিহারে আমরা দেখছি গত দেড়শ বছর ধরে (বন্যার ব্যাপারে) বাঁধ ছাড়া আর কোনো বিষয়ে টাকা খরচই করা হয়নি। মনোযোগই দেওয়া হয়নি।

কোশিতে বন্যা পরের বছরও আসবে। বন্যা কোনো অ-তিথি নয়। তার আসবার তারিখ আগে থেকে ঠিক করা থাকে আর আমাদের গ্রামসমাজ এই আগমনের জন্য তৈরি থাকতে জানত। এখন যত বেশি করে আমরা উন্নত হয়ে উঠছি, তত বন্যার স্বভাব, তার আসবার দিন, এসব ভুলে যাচ্ছি। এ বছর (২০০৪ সাল) বলা হল যে ত্রাণের জন্য খাবার দিতে অর্থাৎ খাবার কেনা, প্যাকেট করা, সেই প্যাকেট ফেলবার জন্য হেলিকপ্টারের খরচা আদিতে, চব্বিশ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। হয়তো দেখা যাবে রুটি তরকারি মানে খাবারের খরচ তার মধ্যে দু কোটি। এর চেয়ে কি অনেক ভালো হত না যদি চব্বিশ কোটির হেলিকপ্টারের বদলে সময় থাকতে থাকতে সরকার ওই এলাকায় কমপক্ষে যে বিশ হাজার নৌকো আছে সেগুলি ব্যবহারের ব্যবস্থা করতেন, স্থানীয় জেলে মাঝিমাল্লাদের উপযুক্ত মর্যাদা দিয়ে তাঁদের কাজে লাগাতেন? এই মানুষরা বন্যার জলে সাঁতার দিয়ে বেড়ে উঠেছেন, বন্যাকে এরা ভয়ংকর মনে করেন না। বরং নিজেদের চেনা পরিচিতদের মধ্যে বলেই ধরেন। তাঁদের হাতে কুড়ি হাজার নৌকা তৈরি থাকত,

ডি.এম কিংবা অন্য কোন দফতর কিংবা এমনকি অঞ্চলে বিশ্বাসযোগ্যতা আছে এমন কোনও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কাছে সেই তালিকার রেজিস্ট্রার রাখা, কোনও কোনও গ্রাম বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, সেখানে কত খাবার প্রয়োজন পড়তে পারে, প্রয়োজনের সময় কোন কোন নৌকো কোন কোন গ্রামে যাবে সেসব নির্দিষ্ট করে দেওয়া-এই অতি প্রয়োজনীয়ি কাজগুলো যদি সরকার ও প্রশাসন যথেষ্ট আগে করে রাখেন তাহলে বন্যায় যেখানে যেখানে ত্রাণ পৌঁছানো উচিত সেসব জায়গার মানুষ রক্ষা পান এবং খরচও মনে হয় চব্বিশ কোটির চেয়ে অনেক নিচেই থাকবে।

বন্যা আজ নতুন শুরু হয়নি। অনেক আগেকার সাহিত্য রচনা যদি কেউ দেখেন তবে দেখবেন এ দেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি বাবু রাজেন্দ্রকুমারের আত্মজীবনীতেও ছাপরা জেলায় এক ভয়ানক বন্যার উল্লেখ আছে। এক ঘন্টায় বৃষ্টি হয়েছিল ছত্রিশ ইঞ্চি। সম্পূর্ণ ছাপরা জেলা জলে ডুবে গিয়েছিল। তখনও ত্রাণের কাজ এরকমই হয়েছিল, রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মীরা সরকারের থেকে অনেক বেশি মাত্রায়, অনেক যত্ন নিয়ে ত্রাণে নেমেছিলেন। সেই লেখাতেও অভিযোগ আছে যে সরকারি প্রশাসন বন্যাত্রাণে বিশেষ কিছুই করেনি। আজও বন্যা আসে, একই অভিযোগ আজও শোনা যায়। ভবিষ্যতের বিখ্যাত নেতাদের রোজনামচাতেও এই রকই আক্ষেপ লিপিবদ্ধ থাকবে। খবরের কাগজেও ছাপা থাকবে একই রকম খবর। আমাদের যদি সত্যিই অন্য রকমের কার্যকর কিছু করে দেখাতে হয় তাহলে নেপাল, বিহার, পশ্চিমবাংলা ও বাংলাদেশের প্রতিনিধিরা একত্র হয়ে কথাবার্তা বলতে হবে। সামাজিক স্মৃতির মধ্যে খুঁজে দেখতে হবে সেকালে এইসব জায়গায় বন্যা থেকে রক্ষা পাওয়ার কোন কোন উপায় ছিল। দরকার হলে তার আদানপ্রদান করতে হবে। সেই উপায়ের সঙ্গে কিছু নতুন জ্ঞান যুক্ত করে কি তাকে আরো কার্যকরী করে দেওয়া যাবে নাকি যেমন ছিল ঠিক সেইভাবেই সেই জ্ঞানকে প্রয়োগ করা যাবে-এসব বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে ভাবনা ও আলোচনা হওয়া জরুরি।

প্রথম দিকে ইংরেজরা যখন এই এলাকায় জল বা বাঁধ কি এমব্যাংকমেন্টের কাজ করাচ্ছিলেন তখনও তাদের মধ্যে দুই একজন দক্ষ ও সহৃদয় প্রশাসক বা চিফ ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন যাঁরা এ দেশের নানান বিষয়ে যত্নবান ছিলেন। এ দেশের মাটি ও কৃষকদের তাঁরা বুঝবার চেষ্টা করতেন। তাঁরা নিজেদের সরকারকে বলেন যে সরকার সে সময় পর্যন্ত উত্তর বিহারের নদী ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য যে সব কাজ করেছেন তাতে প্রভূত ক্ষতি হয়েছে। এরকম প্রামাণিক লেখাপত্র এখনও দুর্লভ নয়। কিন্তু এই সমস্যার প্রকৃত সমাধানের জন্য সবচেয়ে আগে প্রয়োজন সদিচ্ছা, তারপর উদ্যোগ।

তা না হলে উত্তর বিহারের বন্যা সমস্যার কোন উত্তর পাওয়া যাবে না।

ভাষান্তর: জয়া মিত্র

সৌজন্যে: ভূমধ্যসাগর, পৌষ ১৪১৫, ডিসেম্বর ২০০৮